Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.128-136
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ ও ‘চিলেকোঠার সেপাই’: আখ্যানের কাহন ও বাস্তবের নিরিখে বহুকৌণিক স্বরের ভিন্ন গমক

সমরজিৎ শর্মা

পিএইচ.ডি গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

***Abstract*:**

Time is an integral part of a novel. Akhtarujjaman Iliyas' _Chilekothar Sepai_ and _Khowabnama_ show how a skilled novelist can effortlessly handle the truth depicted in a novel. We have not seen a lot of writers gaining fame in their very first attempt at writing novels. Bibhutibhushan Bandyopadhyay's _Pather Panchali_ and Abu Ishaq's _Surja Deeghal Bari_ remind of such instances. _Surja Deeghal Bari_ made Abu Ishaq's name an enduring one in the literary world of Bengal.

From the language movement of 1952 to the liberation war of 1971- they all enter the literary space, where cultural conflict and political struggle become inseparable. As we have experienced political changes in post-colonial India, the literary world has also transformed after the independence. Even in Bangladesh, events like the language movement and the liberation war have made the literary stream change its course. We have seen the transformation of world literature as the Russian Revolution brought about some significant socio-economic and political changes. The fact is that revolutions give rise to path-breaking literary creations. Those creations, like individual tunes, contribute to the polyphony of different literary works. This paper will attempt to analyze the novels from the perspective of comparative literature. It will also try to understand the novel as a literary genre.

Keywords: Movement, Narrative Technique, Polyphony, Transformation, Rituals, Socio-economic, Post Colonial.

সময় উপন্যাসের আধার এবং আধেয় এই সাধারণ সত্যকে বড় মাপের ঔপন্যাসিক কতখানি পরিচালিত করতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এবং ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসদ্বয়ে। প্রথম সাহিত্যকর্মে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা সাহিত্য জগতে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। প্রাসঙ্গিকভাবে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে তেমনি দেখা যায় আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসের জন্য। এই উপন্যাসেরমধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করতে সমর্থ হয়েছেন আবু ইসহাক।

১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনায়াসে সাহিত্যে ঢুকে পড়ে, যা সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ লড়াই একই বিন্দুতে এসে পৌঁছায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের দেশে যেমন রাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটেছে তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে এমনকি বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ায় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সাহিত্যের আঙিনায়। সেখান থেকে সাহিত্যের নানা বাঁকবদলের রূপ নেয়। রুশ বিপ্লবের পরেও বিশ্বসাহিত্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে বদল হতে শুরু করে বিশেষ করে সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ে। আসলে বিশ্বে যখনই কোনো আন্দোলন বা বিপ্লব শুরু হয় তখনই নতুন নতুন বাঁকবদলকারি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সেই সাহিত্য থেকে নানা বর্গ কিংবা নতুন গমক সৃষ্টি হয়।

মাত্র দুটি উপন্যাস ‘চিলেকোঠার সেপাই’ (১৯৮৬) এবং ‘খোয়াবনামা’(১৯৯৬) লিখেই বাংলা সাহিত্যে বিরলপ্রজ ঔপন্যাসিক হয়ে রইলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আর এক ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক তাঁর ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’র (১৯৫৫)জন্য আজও পাঠকের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে কিন্তু ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ এবং ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এই দুটি উপন্যাস নির্বাচনের কারণ সূর্য দীঘল বাড়ীতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে পূর্ববাংলা প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের অসহায় জীবন, খাদ্যের তীব্র সঙ্কট, মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ প্রচলন ও নানান গ্রামীণ কুপ্রথা নিয়ে একটি কালজয়ী উপন্যাস। ‘চিলেকোঠার সেপাই’তে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত-- পড়লেই বোঝা যায় লেখক ভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্রের পথে হেঁটেছেন। এটি একটি থ্রিলার বই নয় কিন্তু কোনো অংশে কমও নয়। সেজন্য আমার মনে হয় অন্যান্য যেকোনো উপন্যাস থেকে রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা অনেক বেশি কঠিন। রাজনৈতিক গল্প যদি বাস্তবতার সাথে মিল না থাকে তাহলে তা যেমন সমালোচনার খোরাক যোগায় তেমনিআবার কাল্পনিক হলে তা হারায় পাঠকের আগ্রহ। ইলিয়াস তাঁর লেখাতে বিপ্লব স্যুটটাই রুমে পড়া বসে তত্ত্ব দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে করাননি। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বস্তির শ্রমিক আর গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরাই তাঁর উপন্যাসে বিপ্লবের নায়ককরেতুলেছেন।

এ উপন্যাস রচনার পটভূমি আবু ইসহাক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর যাপিত জীবন থেকে। লেখকের এক পত্রে জানা যায় তেমনই অজানা অনেক কথা। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসহাক ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কর্মসূত্রে ঠিক এই সময় তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাতায়াত করতেন। ঐ সময় তিনি লক্ষ্য করলেন জয়গুনদের মতো দুঃস্থ নারীকে। যারা কত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকে। লেখক গ্রাম বাংলার ওঝা ফকিরের ঝাড়ফুঁক ও অসহায় নারীদের দুঃসহ জীবন সংগ্রামও দেখেছেন। লেখকের বক্তব্য থেকে যতটা জানতে পারা যায়, তাঁর মামাবাড়ির পাশের ছোট একটি ভিটে ছিল, সেই ভিটের নাম ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’। কোনো মানুষের পক্ষে সেই বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এইরকম কাহিনী তাঁর মায়ের কাছ থেকে শুনেছেন। লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা ও পরিণত বয়সে নারায়ণগঞ্জের রেলস্টেশনে স্টিমার ঘাটে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মায়ের কাছ থেকে শোনা নানারকম কিংবদন্তি একত্রে গ্রথিত হয়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে।

একটু বাঁচার তাগিদে স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুন অনেক আশা করে ছেলে মেয়েকে নিয়ে শহরে আসে কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে। তারা আর গ্রামে থাকতে চাইছে না শহরে যাচ্ছে অর্থাৎ আধুনিকতাকে ধরতে চাইছে।

শহরে মজুরদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের আয়োজন দেখে আকৃষ্ট করেছিল শহরে যেতে। একমুঠো ভাতের জন্য বড়লোকের বন্ধ দরজায় ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে নেতিয়ে পড়ে কিংবা রাস্তার পাশে কুকুরের সাথে আবার কাটাকাটি করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েও এক মুঠো ভাত জোগাড় করতে পারেনি। শহরের অলীক বা মিথ্যা হাতছানি তাদের শহরের বুকে ঠাঁই দেয়নি বরং দূর করে দিচ্ছে গলাধাক্কা দিয়ে, যে আশা নিয়ে জয়গুনরা শহরে এসেছিল, সেই আশা না মেটায় আবার গ্রামে ফিরে যেতে হয়। ক্ষুধা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুধা বনাম হিংসা দেখা যাচ্ছে। উপন্যাসে কেন্দ্র ও প্রান্তের কথা বলা হয়েছে। অভাবের জন্য যেটুকু ভিটেমাটি ছিল সেগুলি বিক্রি করে শহরে চলে যায়। তারা উদ্বাস্তু হয়ে যায়। শহর থেকে ফিরে এসে শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হয় 'সূর্য দীঘল বাড়ী' তে। এই বাড়ির চারদিকে ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি, কেউ থাকে না। থাকার সাহসও পায় না। জয়গুনের থাকতে বাধ্য হতে হয় কেননা তার কোনো উপায় নেই -- উদ্বাস্তু জীবন। গ্রামের লোকের মুখে ঐ পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ি নিয়ে নানান কথা, গ্রামের অনেকের ধারণা, যে ওই বাড়িতে থাকবে তার বংশ নির্মূল হবে। গ্রামের লোকেরা অলজ্ঘনীয় হিসেব মানে যেন –

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূব দুয়ারী তাহার প্রজা
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই। (সূর্য দীঘল বাড়ী , ৪০)

গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষের কাছে অন্ধবিশ্বাস একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জয়গুনের কোনো উপায় না থাকায় সূর্য দীঘল বাড়ীতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আস্তানা গড়ে। বহুদিন বাড়িটি পড়ে থাকায় ভূত-প্রেতের উপদ্রব ও বংশনাম হওয়ার হাত থেকে ধর্ম ব্যবসায়ী জোবেদ আলীর দ্বারস্থ হয়। জোবেদ আলী ঝাড়ফুক কিংবা ওঝার দিক দিয়ে গ্রামে সুপরিচিত রয়েছে। জোবেদ আলী মন্ত্রের সাহায্যে ওই বাড়ির চারিদিক বন্ধ করে দেয়। ফলে আপাতত বাড়ির চালে ঢিল পড়া বন্ধ হয়। তবে জোবেদ আলীর অন্য উদ্দেশ্য ছিল।সে বিধবা জয়গুনের সঙ্গে কাম লালসা চরিতার্থ করতে চায়। জয়গুন প্রতিবাদী ও সাহসী মহিলা। জয়গুন তীব্রভাবে তা প্রতিহত করে। অন্যদিকে গ্রামের মাতব্বর গদু প্রধানের একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও গোপনে জয়গুনকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। জয়গুন তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বজায় রাখে। এইরকম নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চলতে হয় জয়গুনকে। গ্রামের অন্যান্যদের মতো জয়গুনও বিশ্বাস করে, বাড়ির মুরগির প্রথম দিনের ডিম নামাজের সময় মসজিদে দিতে হয়। এটা অতীতে ছিল, এখনও কিছুটা হলেও লোকেদের মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে। এইসব বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে অটুট বাসা বেঁধেছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী প্রহার সম্পর্কে গ্রামের সাধারণ মানুষের ধারণা, শরীরের যে অংশ স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হবে সেই অংশ স্বর্গে যাবে।

জীবিকার সন্ধানে জয়গুন ফেরি করার কাজ নেয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে চড়ে ময়মনসিংহ যায়। সেখান থেকে সস্তায় চাল কিনে তা বিক্রি করে কোনো রকমে সংসার চালায়। তাতেও তার সংসার সংকুলান হয় না। সেজন্য কিশোর ছেলেকে পাঠাতে হয় কুলির কাজ করতে। ছেলে হাসু নম্বরধারী দক্ষ কুলিদের মতো নয়,তাই সে স্টিমার ঘাটে কুলির কাজ ছেড়ে দেয়। সেজন্য তাকে বাধ্য হয়ে বিকল্প পথ বেছে নিতে হয়। হাসু গভীর নদী সাঁতরে স্টিমার চড়ে যাত্রীদের বোঝা ধরতে হয় নম্বরধারী কুলিদের চেয়ে কম ভাড়ায়। এভাবেই দুর্বিষহ জীবনযুদ্ধে সামিল হতে হয় জয়গুনদের। বিধবা জয়গুনের কন্যা মায়মুনের বিয়ের আসরে

গ্রামের সোলেমান খাঁর ছেলে, সদাগর খাঁর নাতি যুবক ওসমানের সঙ্গে। বিয়ের আসরে এ সুযোগটি কাজে লাগাতে চায় গদু প্রধান। বিয়ের আসরে ভরা মজলিসে মৌলবীর নির্দেশে সমাজ নেতা গদু প্রধান জয়গুনের বেয়াই সোলেমান খাঁর আদেশ করে যে, জয়গুনকে তার পর্দাহীন তার জন্য 'তোবা' করতে হবে। তা না হলে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। তখন মৌলবী সাহেব বলেন, 'বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী সমান'(তদেব, ৮৪)। জয়গুন তার গৃহপালিত মুরগির প্রথম ডিম মৌলবী সাহেবকে উপর দেয়। কিন্তু জয়গুন মানে না বলে মৌলবী সাহেব ঐ ডিম গ্রহণে আপত্তি জানায় ও অস্বীকৃত হয়। পর্দাহীন মহিলার পাঠানো দ্রব্য মৌলবী সাহেব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। আসলে, জয়গুনের প্রথম স্বামী ছিল মুনশি। মুনশি পুঁথি পাঠ করে পর্দাহীনতার অপরাধে নরকে শাস্তির কথা শোনাত, জয়গুনের তা মনে পড়ে।

উপন্যাসে দেখা যায়, প্রতিবাদ কণ্ঠী জনগুনকে পরাস্ত হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক বলয়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে একজন প্রতিবাদী নারীকে তার মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে মিথ্যে অপবাদ গায়ে মেখে হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতে হয়। লেখক উপন্যাসটি লিখেছেন তলদেশের ইতিহাস (History From Below) থেকে। একজন মানুষ মিথ্যে বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলছে সমাজ তাকে বের করে দিচ্ছে। এবং জয়গুন তার মেয়ে মায়মুনের সাংসারিক জীবনে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কাফকার বিখ্যাত উপন্যাস 'মেটামরফোসিস' এ দেখা যায় গ্রেগর সামসা সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলছে বলে তাকে শেষ পর্যন্ত পোকায় পরিণত হতে হচ্ছে অর্থাৎ সমাজের (প্রতিষ্ঠান) বিরুদ্ধে কথা বললে তোমাকে তার বাইরে বের করে দেবে এবং প্রান্তে ঠেলে দেবে। আসলে সমাজব্যবস্থা হল একটি Power Structure। উপন্যাসে দেখা যায় কেন্দ্র ও প্রান্তের কথা চলে আসছে। লেখক সুন্দরভাবে মুসলিম গ্রামীণ সমাজের নানা দিক তুলে ধরেছেন। লক্ষণীয়, মায়মুন বাড়ির চারপাশে ঘুরে ছোটবড় নানারকম শামুক কুড়িয়ে আনে। দা দিয়ে সেগুলোর খোসা ছাড়ায়। তারপর কুচিকুচি করে কাটতে কাটতে লোকগান গায় –

> 'শামু খাজারে, আমার বাড়ী আয়,
> কুচিকুচি শামুক দিমু, হলদি দিমু গায়,
> ওরে শামুক খাজারে।
> তোর বাড়ী অনেক দূরে, সাতপাক ঘুইরে ঘুইরে
> আমার বাড়ী আয় '। (তদেব, ৪৩)

এই উপন্যাসের নায়ক কোনো ধনী পরিবারের নয়। একেবারে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তবরূপ দিয়েছেন। মাঠে যখন ধান কাটা শুরু হয় তখন সমবেত কৃষকদের গান ভেসে আসে—

> 'কচ-কচা-কচ কচ কচ কচ
> ধানের কাটি
> মুঠা মুঠা ধান লইয়া বান্দি আঁটিরে।
> (ও ভাই) ঝিঙগাশাইলের হুডুম ভালা
> বাঁশফুলেরই ভাত,
> লাহি ধানের খইরে ভালা,
> দইয়ে তেলেসমাত --রে'। (তদেব, ৮৬)

উপন্যাসে গ্রাম বাংলার লোকভাষার প্রচলন ব্যবহৃত হয়েছে। আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। দারিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ যন্ত্রণার বেদনা হয়ে উঠেছে বহুকৌণিক স্বরের গমক।এক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ' লালসালু 'উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। 'লালসালু' র মতো এ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মানুষের আলো অন্ধকারের পথ।কুসংস্কারের ভেতরে প্রবেশ করে নগ্ন করে দেখানো হয়েছে কুসংস্কারের প্রকত মূর্তি।এ উপন্যাস পাঠে মানুষের ভেতরকার অন্ধকার অলিগলির সন্ধান পাওয়া যায় ঘটনা পরম্পরায়। ভাষার দিক থেকে উপন্যাসটি অতি সহজপাঠ্য হলেও ঘটনা বর্ণনায় আছে গভীরতা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'(১৯৮৬) এবং 'খোয়াবনামা'(১৯৯৬)এই দুটি উপন্যাস লিখেই বাংলা সাহিত্যে বিরলপ্রজ ঔপন্যাসিক হয়ে রইলেন। তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই' বাংলা উপন্যাস জগতে বহুলপঠিত উপন্যাস। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে লেখা এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ মূলত দুটি রেখায় বিন্যস্ত প্রথমত - ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কালে উত্তাল রাজনৈতিক শহর ঢাকা, দ্বিতীয়ত- শ্রেণি সংঘাত গ্রামীণ জনপদের আশ্রয়ে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের বহিরাবরণ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ওসমান, তার আত্মসন্ধান, আত্মরক্তক্ষরণ ও আত্মউজ্জীবনের চেতনাস্রোত মূলত 'চিলেকোঠার সেপাই' এর মৌল জীবনার্থ। এই দুটি ঘটনার সমান্তরাল এবং সংঘর্ষে নির্মিত হয়েছে এই উপন্যাসের জীবন কাহিনী। ষাট সালের দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও আন্দোলনের সাক্ষী 'চিলেকোঠার সেপাই'। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রঞ্জু ওরফে ওসমান, ওসমানের বন্ধু আনোয়ার আর আলতাপ। ওসমানের দুই বন্ধু দুই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী- আনোয়ার বামপন্থী আর আলতাফ ডানপন্থী। এদের দুই বন্ধুর কথাবার্তার মাধ্যমে রাজনৈতিক জটিলতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। গল্পের ফোকাস কখনো ছিল হাড্ডি খিজিরের উপর কখনো বা আনোয়ারের উপর। তবে পুরো গল্পের অস্তিত্ব ছিল ওসমানের উপর। ওসমান বাস করতো ঢাকার এক ঘিঞ্জি গলির মধ্যে। সে অফিসের এক জুনিয়র কর্মকর্তা। তার দুই বন্ধু রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেও ওসমান এইসব থেকে দূরে থাকত - সে যেন চিলেকোঠাতে বন্দী।এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মনোবিশ্লেষণ। ঊনসত্তর সালের প্রবল গণঅভ্যুত্থানে যারা প্রধান শক্তি ছিল, সেই শ্রমজীবী জনসাধারণ কীভাবে আন্দোলন পরবর্তী সময়ে প্রতারিত এবং বঞ্চিত হল, বামপন্থীদের দোদুল্যমান আর ভাঙনের ফলে, জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথ ভাবে ধারণ করতে না পারার ফলে অজস্র রক্তপাতের পরও রাজনীতির ময়দান থেকে তাদের পশ্চাদপরণ ঘটলো। বাংলাদেশের জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ প্রধান শক্তি হয়ে উঠলো। উপন্যাসের উপজীব্য সেই ঐতিহাসিক সময়টুকুই। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ওসমান, বাকি দুজনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে- আনোয়ার আর হাড্ডিখিজির। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দ্যোতনা উপন্যাসটিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছে। এই উপন্যাসের একদিকে হাড্ডিখিজির যেমন মহাজনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে উঠতি আওয়ামী লীগের নেতা আলাউদ্দিন মিয়ার ধমক খায়, গ্রামে গ্রামে গরু চোরদের রক্ষাকর্তা জোতদারদের রক্ষায় রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী আওয়ামী রাজনীতি একাকার হয়ে যায়। ঢাকা ক্লাব থেকে আইয়ুব বিরোধী মিছিলে গুলি বর্ষণ করা হলে উত্তেজিত জনতা ক্লাবটিকে আগুন ধরাতে যায়, আর সেই সুযোগে তারা বাঙালি বাঙালি ভাই ভাই বলে রক্ষা করে।

ঊনসত্তরের সংগ্রাম ও মিছিল তরঙ্গিত রাজনৈতিক শহর ঢাকা। এই সময় মধ্যবিত্তের ব্যক্তিসর্বস্ব, আত্মপ্রেম ও আত্মনিগ্রহ পরায়ণ চেতনা প্রবল গণআন্দোলন টানে কীভাবে চিলেকোঠার বিচ্ছিন্ন জগত থেকে বেরিয়ে আসে ওসমান গনি তার দৃষ্টান্ত। ওসমান মধ্যবিত্তের সন্তান,সে অফিসের কেরানি করে। সে বাস করে পুরাতন ঢাকারএক চিলেকোঠার ভাড়ার মধ্যে। তার উদ্বেগের কারণ সে বাদে তার পরিবারের অন্যরা সবাই ভারতের অধিবাসী। একটি ঘটনার প্রত্যাশার ফলে খাবার খেতে খেতে ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তারা জানা হয়ে যায়। বিষয়টা হচ্ছে গত কয়েক দিনে সারা পাকিস্তান জুড়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদদের জওয়ানরা। যারা দেখতে এসেছিল তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিবাদী ছাত্রদের ভূমিকা কী হবে সেজন্য ওসমান ছড়িয়ে থাকা মানুষের কাছে হাজির হয়। কিন্তু ততক্ষণে মাইকের শব্দ ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। মাইকের শব্দকে অতিক্রম করে তাদের শ্লোগান দীপ্ত কণ্ঠ ওঠে - 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না', 'পুলিশি জুলুম পুলিশি জুলুম বন্ধ করো বন্ধ করো'। গেটে দাঁড়ানো উঁচু লম্বা সাদা ধূসর ঘোড়াদের পা কাঁপে কারণ এইসব দীপ্ত শ্লোগানের আওয়াজ শুনে। 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো'। শ্লোগানগুলো একটি একটানা আওয়াজ মিলিত হয়ে করোটির দেওয়াল দৃপ্ত করে তোলে। তারা বলতে থাকে - শুয়োরের বাচ্চা আইয়ুব খান মোনেম খানের চাকর বাকরের দল দ্যাখ! ভালো করে দেখে নে, তোদের সামনে খালি হাতে কেবল বুক সর্বস্ব করে তোদের বাপ আইয়ুব খানকে চ্যালেঞ্জ করতে এসেছে এরা! ভরা গলায় ওসমান শ্লোগানের জবাব দেয়, 'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই '।

এই উক্তি থেকেই পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, ওসমানের আত্মপরিচয়ের উপলব্ধি। তবুও সমষ্টি থেকে পরবর্তী ওসমানের জন্য সংঘচেতনার উদ্দীপক হিসেবে অসংগঠিত কিন্তু স্বত:স্ফূর্ত সংগ্রামী খিজিরের প্রয়োজন হয়। আসলে, খিজিরের যে অভিজ্ঞতা এবং অবদান রয়েছে যা ওসমানের ব্যক্তি ভূগোলের সীমাকে ঊনসত্তরের সংগ্রামী জনসমুদ্রে প্রসারিত করে দেয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট চেতনাগত বিস্তারকে অতিক্রম করে যায়, অন্যদিকে স্লোগান মুখরিত হয়ে ওঠে জনসমুদ্রে। ওসমান ছাদে যায়। শওকতের পাশে দাঁড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দেখল মাত্র সাতজন লোকের সঙ্গে স্লোগান দিতে দিতে দিতে নামল খিজির আলী - 'সান্ধ্য আইন সান্ধ্য মানি না মানি না, আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো - দিকে দিকে আগুন জ্বালো; জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো'(চিলেকোঠার সেপাই , ৭৫)। আবার কয়েক মিনিটের ভেতরে নানাদিক থেকে স্লোগানের প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। খিজিরের সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে লোক এসে জমা হয় - মোহল্লার গলি, উপগলি , শাখাগলি থেকে। তাদের মধ্যে কেউ বলে ওঠে এত লোক কোত্থেকে আসে, পাড়ায় কি এত লোক আছে? এবার ওসমানের বোঝা ঠিক সম্ভব হয়েছে। এত মানুষ আসছে একশো বছর আগে সাহেবদের হাতে নিহত, সাহেবদের পোষা কুকুর, নবাবদের হাতে মিরাটের সেপাই , বেরিলির সেপাই, লক্ষ্ণৌ এর মানুষ, লালবাগের মানুষ। এত লোক দেখে ওসমানের গা চমকে উঠলেও তার কোনো ভয়ের কারণ নেই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জাতীয় রাজনীতির অন্তস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। দেশে ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের টানে জাতীয় রাজনীতিতে মুক্তির সম্ভাবনা পথ উন্মুক্ত হলেও সাধারণ মানুষের জীবন প্যাটার্নের গুণগত পরিবর্তন দুঃস্বপ্নই থেকে যায়। ওসমানের আত্মরূপান্তরের একারণেই সম্ভবত তার শ্রেণিসত্ত্বার বিলুপ্তি নির্দেশ করেন ঔপন্যাসিক। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও সংগ্রামে পরিণত হয়।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবমনে যেমন রূপান্তরের পটভূমি পরিবর্তন হয় সেভাবে উপন্যাস শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় - প্লট, চরিত্রায়ন, সংগঠন, দৃষ্টিকোণ, ভাবনা, প্রতীকায়ন কিংবা ব্যাখ্যাতীত অর্থ, দ্বন্দ্বময় বিষয়বস্তু জটিল জীবন সংকট। প্রসঙ্গক্রমে বিদেশি সাহিত্যের কথা বলা যেতে পারে, যেমন জেমস জয়েসের ‘ইউলিসিস’ উপন্যাসের এপিক ফর্ম , ভার্জিনিয়া উলফের বৈজ্ঞানিক মনোসংগঠন মুখিতা, সার্থের বহুমাত্রিক অস্তিত্ব, অভিপ্সা,আলবেয়ার কাম্যুর বিচ্ছিন্নতাবোধের অন্তর্ব্যাকরণ এবং স্যামুয়েল বেকেটের মানব অস্তিত্বের মৃত্যুমুখ প্রতীক্ষা উপন্যাস শিল্পের এই মৌলিক পরিবর্তনের সমন্বয়ে জন্ম নিল এক নব্যবাস্তবতার ধারণা । এই নব্যবাস্তববাদী ধারাই বিশ্বযুদ্ধোত্তর দীর্ঘ সময় পরিসরে ভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে (The realist tradition in a new form, altered in technique but continuous in experience)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সমাজ, ইতিহাস ও সভ্যতা সতর্ক ঔপন্যাসিকরা ফর্মের নির্ধারিত ছকের মধ্যে জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে নতুন শিল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজে প্রথাগত অবরুদ্ধ বৃত্তাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ষাটের দশকে যুগান্তকারী পরিবর্তনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বরূপ ও জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া ছিল জটিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বময়। ইলিয়াস লক্ষ্য করলেন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বাংলাদেশের অপরিণত মধ্যবিত্ত জীবনের যে দ্বিধাদীর্ণ চাঞ্চল্য, কালিক দূরত্ব থেকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে শিল্প সংকট সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন ইলিয়াস। ইলিয়াস বুঝলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে শিল্প প্রকরণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন ফর্মকে আঁকড়ে ধরেছে। তিনি ‘চিলেকোঠার সেপাই’ কে চিরায়ত রূপের মধ্যেই আধুনিক জীবনের জটিল সংকটকে রূপ দিয়েছেন। এ উপন্যাসে অনুভব করা যায় গ্রাম শহরের জীবনস্পর্শী মানুষের সংঘাতময় অন্তঃস্পন্দন । বিচিত্রধর্মী ঘটনা নানা মাত্রিক চরিত্র এবং উৎকণ্ঠিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিস্ফোরণ উন্মুক্ত এক আত্মসত্তার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে তমিজকে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে যেমন অনন্য হয়েছেন ইলিয়াস সেভাবেই ওসমানের ব্যক্তিকথায় বিধৃতকালের আত্মরতি, আত্মমৈথুন ও সিজোফ্রেলিয়া আক্রান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের বৃত্তভাঙার প্রক্রিয়া উপস্থাপন করলেন।

ইলিয়াস উপন্যাসে স্থান-কাল ও পাত্র নির্বাচন সাধারণ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তির সাক্ষ্য দেয়। তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন ধূসর বাস্তবতাকে সুবর্ণ কল্পনায় রঞ্জিত করার দুর্বলতা বিষয়ে। নোবেলজয়ী ভি.এস.নইপলের মতো ইলিয়াস বিবর্ণ বাস্তব ঘাঁটতে পছন্দ করতেন। সলমন রুশদি কিংবা গার্সিয়া মার্কেজ যেমন বাস্তবতা বর্ণনায় খেই হারিয়ে জাদুবাস্তবতার (Magic Realism) জাল বোনেন, উপন্যাস ছেড়ে চলে যান অধি উপন্যাস (Meta Fiction), ইলিয়াস ও তার ধারে কাছেও ঘেঁষেন না। ইলিয়াসের আগ্রহ নিটোল বাস্তবতা যার ভিত্তি গ্রোথিত আছে সমাজ কিংবা রাজনীতিতে।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আগে উপন্যাসে যে ধরণের টেকনিক ছিল, বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উপন্যাসে বাঁক বদল ঘটেছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং শ্রেণি সংঘাত গ্রামীণ মানুষের নিয়ে রচিত উপন্যাসের বহিরাবরণ। ইলিয়াস নতুন বাঁককে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে (Literary History) সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নতুন আঙ্গিকে রূপ দিতে চেয়েছেন। উপন্যাসে বর্গ (Genre) কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অর্থাৎ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে যে কাহিনী লেখা হয়েছে সেখান থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরবর্তী শ্রেণি সংঘাত গ্রামীণ মানুষদের নিয়ে যে কাহিনীর বুনন তৈরি করেছেন ইলিয়াস

সেখানেও বর্গ (Genre)পরিবর্তিত করে উপন্যাসকে নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করলেন। একটি পাঠ (Text) তৈরি হয় অগণিত পাঠের সহযোগে, বহু পাঠসংস্কৃতি থেকে। অর্থাৎ চারিদিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট উপন্যাসের কাহিনীকে ভিন্ন আঙ্গিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইলিয়াস আধুনিক এক চরিত্র ওসমানকে তুলে ধরলেন। যেমন দেখা যায় আবু ইসহাক বিধবা জয়গুনকে আধুনিক ও বাস্তববাদী চরিত্রে উপস্থাপন করলেন। ওসমানকে দেখিয়েছেন ইলিয়াস উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে একটি বিশেষ শ্রেণির চরিত্র প্রতিনিধিত্ব করলেও ওসমান সেই কালের সীমানা পেরিয়ে এক সর্বজনীন সাধারণ চরিত্রে উন্নীত হয়, যে আমাদের একজন (One of us) হয়ে ওঠে। এখানে ইলিয়াস আধুনিক চরিত্রের বুনন তৈরি করলেন। আলবেয়ার কাম্যুর 'আগন্তুক'এর মার্স কিংবা কাফকার 'মেটামরফোসিস' এর গ্রেগর সামসার মতো বিগত ওসমানও বিচ্ছিন্নতার বেড়াজালে আবদ্ধ। ওসমান এর ক্ষেত্রে আরও যুক্ত হয় আত্মপ্রেম। মার্স এবং গ্রেগর সামসা তাদের বিচ্ছিন্নতার দেয়াল টপকাতে পারে না কিন্তু ওসমান পারে। হাড্ডি খিজিরের মতো অজ্ঞাতকুলশীল, শ্রেণিহীন, সংস্কারহীন এক ক্ষুদ্র শ্রমিকের প্রতি আত্মত্যাগের মহিমা ওসমানের আত্মপ্রেমী মধ্যবিত্ত সত্ত্বার দেয়াল ভেঙে দেয়। আত্মপ্রেম ও বিচ্ছিন্নতার কারাগারে বন্দী রঞ্জু ক্রমশ হয়ে ওঠে গণ মানুষের প্রতিনিধি দেশমাতৃকার মুক্তিকামী ওসমান। চিলেকোঠার সেপাই ভেঙে ফেলে চিলেকোঠার তালা।দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের চরিত্রেরা রক্তমাংসের গড়া এক একটি একটি মানুষ , ইলিয়াসও নির্মাণ করলেন রক্তমাংসের গড়া ওসমান চরিত্র। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানুষ নেমে আসে রাস্তায় - মুক্তির অন্বেষায়। ওসমান হয়ে ওঠে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের হিরো - যার বিশ্বাস কথায় নয় কাজে। ঠিকানাবিহীন ও স্বাধীনতাবিহীন মোহন বিশ্বাস (নোবেল বিজয়ী নইপলের A House For Mr. Biswas এর হিরো) খুঁজে পায় চিরায়ত ঠিকানা। তার আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার প্রতীক, যেখানে মরেও তার শান্তি; ওসমানও তেমনি হয়তো খুঁজে পায় কিংবা খুঁজতে বেরোয় তার মুক্তির ঠিকানা। বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা আর অবসাদের 'অ্যাবসার্ড' বৃত্তে আধুনিক সাহিত্যের আধুনিক চরিত্রগুলো যেখানে চিরআবদ্ধ, মুক্তির প্রয়াস সেখানে দেখা যায় সেই দুর্লঙ্ঘ্য বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে। নরওয়ের বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের 'এ ডলস হাউস' (A Dolls House) নাটকে লৈঙ্গিক শাসন ও পিতৃতান্ত্রিক দেয়াল ভেঙে নোরা যেমন স্বামীর মুখের উপর দড়াম, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে বদ্ধ চিলেকোঠা ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে, খোলা আকাশের নিচে - কারফিউ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীস ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় সেজন্য সংসার বন্ধন ছেড়ে মুক্ত জীবনে যেতে, তবে সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়, সেভাবেই ওসমানও তাই। ওসমান যেদিকে তাকায় সেখানেই তার পূর্ববাংলা, যেদিকে পা বাড়ায় সেখানেই তার প্রিয় মাতৃভূমি। মোহ মুক্তির এই বিপ্লব, বিচ্ছিন্নতা ও সংস্কার ভাঙার এই বিপ্লব। সর্বোপরি বৃত্ত ভাঙার এই বিপ্লব নিঃসন্দেহে একটি বড় বিনির্মাণ। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী আখতারুজ্জমান ইলিয়াস সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ইলিয়াসের নোখের যোগ্য যদি কিছু লিখতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম'। তাঁর এক একটি চরিত্রের বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের বাস্তবতা, কল্পনা, চেতনা, অন্তঃচেতনার মিশ্রণ তিনি চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেন।

সূত্রনির্দেশ

1) ইসহাক, আবু, *সূর্য দীঘল বাড়ী* , কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনী (পুনঃমুদ্রণ ২০১২), ১৯৫৫, মুদ্রণ
2) তদেব, মুদ্রণ
3) তদেব, মুদ্রণ
4) তদেব, মুদ্রণ
5) ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ২০০০, মুদ্রণ